ঝিরিবাঁধ

দেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বিস্তীর্ণ উঁচুনিচু ও গাছপালা, বন জঙ্গল বেষ্টিত পার্বত্য এলাকা। অসমতল, বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি ও দুর্গম অঞ্চল হওয়ায় মাঠ ফসল উৎপাদনের জন্য তেমন উপযোগী নয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের উদ্যান জাতীয় ফসল উৎপাদনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। পাহাড়ি ঝরনা বা ছড়ায় আড়াআড়ি যে মাটির বাঁধ নির্মাণ করা হয় তাকে ঝিরিবাঁধ বলে। উক্ত ঝিরিবাঁধের উজানে সৃষ্ট ছোট ছোট জলাধারের সাহায্যে পাহাড়ি এলাকার জমিতে সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধা প্রদান করা সম্ভব। পার্বত্য এলাকায় সর্বমোট ৮৬টি ঝিরিবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে।

সেচ অবকাঠামো

দেশের ভূ-উপরিস্থ পানিসম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নদ-নদী, খাল-নালায় আধুনিক প্রযুক্তির সেচ অবকাঠামো যেমন-সাবমার্জড ওয়ার, স্লুইস গেট নির্মাণ করা হয়। সাবমার্জড ওয়ার নদী বা খালের আড়াআড়িতে পানির প্রবাহের নির্দিষ্ট উচ্চতায় নির্মাণ করা হয়। ফলে উজানের পানি জলাধারে থাকার পর অতিরিক্ত পানি চলে যায়। অবকাঠামোটি পানির নিচে অবস্থান করে বলে সাবমার্জড ওয়ার বলে। আধুনিক প্রযুক্তির স্লুইস গেট দ্বারা ভূ-উপরিস্থ পানি ধরে রেখে জলাধার সৃষ্টি এবং নিষ্কাশন উভয় কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। সেচ অবকাঠামো নির্মাণের ফলে উৎপাদিত শস্য ও কৃষি যন্ত্রপাতি পরিবহন, সেচ স্কিমে সেচের পানির প্রবাহ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নে সহায়ক হয়।

আইল ব্যবস্থাপনা

সমতল জমি চাষের প্রাক্কালে ১৫-২০ সে.মি. উঁচু করে আইল বেঁধে বৃষ্টি/বন্যার পানি ধরে রেখে জলাধার তৈরি করা যেতে পারে। অথবা জমিতে ক্ষুদ্রাকার জলাধার নির্মাণের লক্ষ্যে জমির তুলনামূলক নিচু অংশে অথবা সুবিধাজনক স্থানে জলাধার নির্মাণ করা যায়। উভয় প্রযুক্তিতে কয়েক দিনের সেচ প্রদান করা সম্ভব।

বৃষ্টির পানি সংগ্রহ

পৃথিবীর পানিসম্পদের মধ্যে বৃষ্টির পানি বিশুদ্ধ, নিরাপদ এবং বিপদমুক্ত। পানি সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধির মতো চলমান সমস্যাসমূহ মিটাতে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ একটি পুনঃব্যবহার পদ্ধতি। বৃষ্টির পানিকে গড়িয়ে যেতে না দিয়ে পুনরায় ব্যবহারের নিমিত্ত জলাধার/ট্যাংকে সংরক্ষণ করাকে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ (Rainwater Harvesting) বলে। সাধারণত পাতকুয়া, টিনের চালা/সসার (Saucer) বা ভবনের ছাদে বৃষ্টির পতিত পানি সংগ্রহ করে পাইপের মাধ্যমে ভূতল বা ভূপৃষ্ঠের জলাধার/ট্যাংকে জমা করা হয়। সংরক্ষিত বৃষ্টির পানি প্রয়োজন অনুসারে খাবার, গৃহস্থালি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনা বা ছাদে সেচ প্রদান করা যায়।

কৃষি প্রধান দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪০% সরাসরি এবং প্রায় ৭৫% প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। দেশের ভূ-উপরিস্থ পানিসম্পদ, যা কৃষি ও মৎস্য সম্পদের উৎপাদনশীল রাখবে, তার নিরাপত্তা বিধানে আধুনিক লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে।

পাতকুয়া ব্যবহারের সুফল:

- ভূ-র্গভস্থ পানির উপর চাপ কমানো;
- খরাপ্রবণ এলাকায় স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন;
- পানি উত্তোলনে সৌর শক্তির ব্যবহার করা;
- বৃষ্টির পানি ভূ-র্গভে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে ভূ-র্গভস্থ পানির স্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি করা;
- এলাকার পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

কৃষিবিদ আকলিমা খাতুন
তথ্য অফিসার (উদ্ভিদ সংরক্ষণ)
কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

মুদ্রণ: কৃষি তথ্য সার্ভিস, সংখ্যা : ২০,০০০ কপি/ মার্চ, ২০২৪

কৃষিক্ষেত্রে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার

কৃষি তথ্য সার্ভিস
কৃষি মন্ত্রণালয়
www.ais.gov.bd

ভূ-উপরিস্থ পানি সংগ্রহ প্রযুক্তি

বর্তমান সরকার সেচ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনায় সেচের পানির অপচয় রোধ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও সেচ খরচ হ্রাসের নিমিত্ত সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানির সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যবহার বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে নিম্নবর্ণিত প্রযুক্তি গ্রহণ করা যেতে পারে। বরেন্দ্র এলাকার বৃষ্টিপাত দেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় অনেক কম। সাম্প্রতিক সময়ে এর পরিমান আতো হ্রাস পেয়েছে।এভাড়া বৃষ্টিপাতা পূর্বের ন্যায় যথাসময়ে হচ্ছে না। সর্বোপরী সংস্কারের অভাবে নদী ও বিল গুলোর পানি ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ায় কৃষিকাজ ক্রমান্বয়ে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।এর ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর দিনদিন নিচে নেমে যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য সেচ কাজে ভূ-পরিস্থ পানি (Surface Water) ব্যবহারের উপর ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ গাঙ্গীয় ব-দ্বীপ ও নদীমাতৃক দেশ। এদেশে ছোটবড় প্রায় ৩২০ টি নদ-নদী রয়েছে। তন্মধ্যে ৫৭ টি আন্তঃদেশীয় নদ-নদী দেশের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হয়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানিসম্পদ বলতে দেশের ওপর পতিত বৃষ্টিপাত এবং বহির্দেশ থেকে আগত জল প্রবাহকে বুঝায়। দেশে ভূ-উপরিস্থ মোট পানিসম্পদের পরিমাণ ১,৩৫০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার (বিসিএম)। তন্মধ্যে নদ-নদীতে ১,০১০ বিসিএম এবং বাকি ৩৪০ বিসিএম বাৎসরিক বৃষ্টিপাত (২০০০-২৫০০ মিমি)। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, দেশে ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বনিম্ন প্রবাহ ২৯ হাজার ঘনমিটার/সেকেন্ড এবং সর্বোচ্চ প্রবাহ ১৩৭.৭০ লক্ষ ঘনমিটার/সেকেন্ড। ভূপরিস্থ পানি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্থাৎ বর্ষা মৌসুমে (জুন-সেপ্টেম্বর) নদ-নদী, খাল-নালা, হাওর-বাঁওড় ও বিলে থাকে এবং পরবর্তীতে সাগর-মহাসাগরে পতিত হয়। তাই সারাবছর ভূপরিস্থ পানি কৃষি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে সেচের অবদান অপরিসীম। দেশে খাদ্য উৎপাদনে দুই ধরনের সেচ কার্যক্রম প্রচলিত আছে-বৃহৎসেচ ও ক্ষুদ্রসেচ। রবি মৌসুমে ক্ষুদ্রসেচের মাধ্যমে দেশের সেচকৃত জমির ৯৫% এবং বৃহৎ সেচের মাধ্যমে ৫% জমিতে সেচ দেয়া হয়। বর্তমান সরকার সেচ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনায় সেচের পানির অপচয় রোধ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও সেচ খরচ হ্রাসের নিমিত্ত সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানির সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যবহার বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সারাদেশে ২০২০-২১ সেচমৌসুমে ভূ-উপরিস্থ পানির সেচ ২৭% এ উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে ভূ-উপরিস্থ পানিসম্পদের ১.৩৪% সেচ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে নিম্নবর্ণিত উপযুক্ত প্রযুক্তিগুলো হলো:

ড্রেজিং/খনন/পুনঃখনন/সংস্কার

ভরাট বা হাজামজা নদী, খাল-নালা, ডোবা-বিল, পুকুর ড্রেজিং/খনন/পুনঃখনন/সংস্কারের মাধ্যমে পানি প্রবাহের গভীরতা ও প্রস্থতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সৃষ্ট জলাধারে ভূ-উপরিস্থ পানি প্রাপ্যতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ড্রেজার, ল্যান্ড বেইজড এক্সেভেটর এবং এ্যাম্ফিবিয়ান এক্সেভেটর মেশিন খনন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রমে কৃষি, মৎস্য, নৌ-চলাচল, ভূগর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণ বৃদ্ধি এবং ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন হ্রাস পাচ্ছে। সেইসাথে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ এবং সেচ খরচ কমে যাচ্ছে। ফলে উপকূলীয় অধঃপতিত জমি সেচের আওতায় আনয়ন, জলাবদ্ধতা দূরীকরণসহ আবাদী জমি, ফসলের নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে এলাকাভেদে অনেক নদী/খাল/নালার পাড় গ্রামীণ রাস্তা এবং নৌপথে কৃষি যন্ত্রপাতি ও উৎপাদিত ফসল পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বর্ণিত কার্যক্রমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিএডিসি, এলজিইডি, বিএমডিএ ও মৎস্য অধিদপ্তর ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে গ্রামীণ আর্থসামাজিক অবস্থার প্রভুত উন্নতি হচ্ছে।

রাবার ড্যাম

যে সকল ঝরনা/পাহাড়ি ছড়ায় সারাবছর কিছু না কিছু পানি প্রবাহিত সে সকল ঝরনা/পাহাড়ি ছড়া অথবা সমতল ভূমির অনুরূপ নদীতে আড়াআড়িভাবে আধুনিক প্রযুক্তির রাবার ড্যাম (Rubber Dam) নির্মাণ করা হয়। উক্ত প্রযুক্তিতে রাবার ব্যাগ পানি দিয়ে ফুলিয়ে নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত উজানের পানি ধরে রাখা যায়। আবার অপ্রয়োজনীয় সময় ব্যাগ হতে পানি নিষ্কাশন করলে মাটির সাথে মিশে যায়। ফলে বর্ষা মৌসুমে নৌ-চলাচলে অসুবিধা হয় না। ড্যাম নির্মাণের ফলে এলাকায় এক ফসলি জমি দু-তিন ফসলি জমিতে রূপান্তর এবং ফসলের নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। দেশে ইতোমধ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ৬৯টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে।

হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম

যে সকল ঝরণা/পাহাড়ি ছড়ায় সারাবছর কিছু না কিছু পানি প্রবাহিত হয়, সে সকল ঝরণা/পাহাড়ি ছড়া অথবা সমতল ভূমির অনুরূপ নদীতে আড়াআড়িভাবে আধুনিক প্রযুক্তির হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম (Hydraulic Elevator Dam-HED) নির্মাণ করা হয়। উক্ত প্রযুক্তিতে কপাট বন্ধ করে নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত উজান বা ভাটির পানি ধরে রাখা যায়। রাবার ড্যামের তুলনায় হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি খুবই সহজ। এতে অতি অল্প সময়ে উজানের পানি আটকানো ও ছেড়ে দেয়া যায়। প্রয়োজনে ড্যামে আংশিক পানি নিষ্কাশন করা সম্ভব। এ ড্যাম লবণ পানির অনুপ্রবেশ রোধেও কাজে লাগে। দেশে ইতোমধ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ২ টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে।